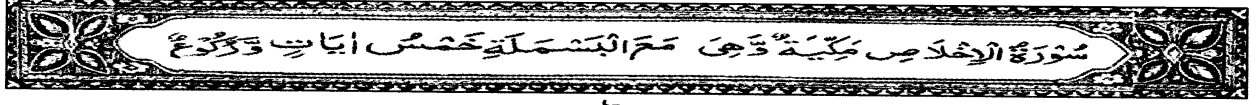


সূরা আল ইখলাস- ১১২

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণের সময় ও প্রসঙ্গ

হযরত হাসান, ইকরামা, সর্বোপরি প্রথম দিকের সর্বজন-শ্রদ্ধেয় সাহাবী হযরত ইবনে মাসুউদের মতে এ সূরা প্রাথমিক পর্যায়ের মক্কী সূরা। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস, যিনি বয়সে হযরত ইবনে মাসুউদ থেকে অনেক ছোট অথচ শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রগণ্য, তিনি মনে করেন, এটি মদীনাতে অবতীর্ণ হয়েছিল। এরূপ অতি-সম্মানীয় দুজন সাহাবীর মধ্যে মতানৈক্য দেখে তফসীরকারদের অনেকে এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন, এ সূরাটি দুবার অবতীর্ণ হয়েছিল, প্রথমে মক্কাতে এবং পরে মদীনাতে। প্রাচ্যবিদ মুইর একে প্রথমদিকের মক্কী সূরা বলে স্থান দেন, আর নলডিকি নবুওয়তের চতুর্থ বছরকালীন সূরা বলে মনে করেন। সূরাটির বিষয়বস্তুর গুরুত্বের কারণে একে বহু নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ নামগুলো হলোঃ তফরীদ, তজরীদ, তওহীদ, ইখলাস, মা'রিফাহ্, সামাদ, নূর ইত্যাদি। যেহেতু এ সূরাটি ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস 'তওহীদ' অর্থাৎ আল্লাহর একত্বকে অতি সংক্ষেপে চমৎকারভাবে এবং সার্থকরূপে বিবৃত করেছে সেহেতু মহানবী (সাঃ) একে কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সূরা বলে অভিহিত করেছেন (মা'আনী)। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, নবী করীম (সাঃ) রাত্রে নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে এ সূরা এবং পরবর্তী শেষ দুটি সূরা অন্তত তিনবার করে পাঠ করতেন (দাউদ)। সূরাটির শিরোনাম 'ইখলাস' দেয়া হয়েছে এ কারণে, এ সূরাটি গভীর মনোযোগের সাথে পড়লে মনে আল্লাহ তাআলার প্রতি গভীর আগ্রহ ও আকর্ষণের সৃষ্টি হয় এবং অনুরাগ ও ভালবাসা জন্মায়। যে বিষয়টি বিশেষ অনুধাবনযোগ্য ও অধিক গুরুত্ববহ তা হলো, 'সূরা ফাতিহা' যেমন সমগ্র কুরআনের সংক্ষিপ্ত সারমর্ম, এ সূরাটিও তেমনি পরবর্তী দুটি সূরার সাথে একত্রে সূরা 'ফাতিহার' বিষয়বস্তুকেই কুরআনের সমাপ্তি পর্বে পুনর্ব্যক্ত করছে। এ সূরা আল্লাহ তাআলার চারটি অনতিক্রম্য ও অননুকরণীয় গুণের উল্লেখ করেছে যেভাবে সূরা ফাতিহায় আল্লাহর চারটি প্রধান গুণ বর্ণিত হয়েছে।



সূরা আল ইখলাস-১১২

মক্কী সূরা, বিস্মিল্লাহ্‌সহ ৫ আয়াত এবং ১ রুকু

১। আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (৩) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। তুমি বল, ৩৪৬৩ তিনিই ৩৪৬৪ ক.এক-অদ্বিতীয় ৩৪৬৫ আল্লাহ ৩৪৬৬।

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ②

৩। আল্লাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ (৩) সর্বনির্ভরস্থল ৩৪৬৭।

اللَّهُ الصَّمَدُ ③

দেখুন : ক. ১৬ঃ২৩; ২২ঃ৩৫; ৫৯ঃ২৩।

৩৪৬৩। 'কুল' (বল বা ঘোষণা কর) শব্দটি দ্বারা এখানে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের জন্য একটি স্থায়ী আদেশ জারী করেছেন : হে মুসলিমরা, তোমরা স্থায়ীভাবে ঘোষণা করতে থাক, 'আল্লাহ এক-অদ্বিতীয়'।

৩৪৬৪। 'হুয়া' (তিনি, সে) এখানে 'যমীরুশ শান' রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। যে কারণে 'হুয়া' অর্থ- এটাই সত্য। সব মিলিয়ে এস্থলে শব্দটির তাৎপর্য হলো, মানুষের মনের প্রকৃতিই এ সত্যের সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ আছেন এবং তিনি এক-অদ্বিতীয়।

৩৪৬৫। 'আহাদ' একটি বিশেষণ যা একমাত্র আল্লাহর ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ এক, একক, যিনি সর্বদাই এক-অদ্বিতীয় ছিলেন, আছেন ও থাকবেন, যার কোন অংশীদার নেই এবং যার মৌলিক গুণাবলীতেও কোন অংশীদার নেই, যার ব্যক্তিত্বে ও সত্তায় দ্বিতীয়ের কোন সমকক্ষতা নেই (লেইন)। 'আহাদ' শব্দটি দ্বারা আল্লাহর ব্যক্তি-সত্তার এরূপ একত্বকে বুঝায় যে দ্বিতীয়ের ধারণাই নির্মূল করে দেয়। আর 'ওয়াহিদ' শব্দটি দ্বারা আল্লাহর গুণাবলীর অনন্যতা ও অতুলনীয়তা বুঝায়। অতএব 'আল্লাহ ওয়াহিদুন' এর তাৎপর্য হবে, আল্লাহ সেই মহান সত্তা যিনি সকল সৃষ্টির আদি উৎস। আর 'আল্লাহ আহাদুন' এর তাৎপর্য হলো, আল্লাহ সেই সত্তা যিনি এমনভাবে সম্পূর্ণ এক ও একাকী যে তাঁর কথা ভাবার বা চিন্তা করার সময় আমাদের মনে অন্য কোন বস্তু বা সত্তার কথা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকে। তাই সকল দিক দিয়েই এবং সকল অর্থেই তিনি এক- অদ্বিতীয়। তিনি কোন শিকলের গুরুর কড়াও নন এবং শেষ কড়াও নন। তাঁর মত কিছুই নেই এবং তিনিও কোন কিছুই মত নন। এরূপই হলেন 'আল্লাহ' যেক্ষেপে পবিত্র কুরআন তাঁকে মানুষের সামনে উপস্থাপন করেছে।

৩৪৬৬। 'আল্লাহ' নামটি কুরআনে পরম সত্তার একক নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় এ শব্দটি কখনো অন্য কোন বস্তু বা সত্তার জন্য ব্যবহার করা হয়নি। আল্লাহ নামটি কোন গুণবাচক বা বর্ণনামূলক নাম নয় বরং এটা তাঁর মৌলিক নাম (টীকা ৩ দেখুন)।

৩৪৬৭। 'সামাদ' অর্থ সেই সত্তা যার উপর সকলেই ও সবকিছুই নির্ভরশীল, যার প্রতি আনুগত্য দেখানো ছাড়া গত্যন্তর নেই, যাকে ছাড়া কোন কাজই সম্পাদিত হতে পারে না, এমন ব্যক্তি বা স্থান যার উপরে কেউ বা কিছুই নেই। 'সামাদ' আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নাম যার অর্থ সেই সর্বোচ্চ সত্তা যার উপর নিজ নিজ প্রয়োজন মিটাবার জন্য সকলকেই নির্ভর করতে হয়। সকলেই এবং সবকিছুই তাঁর উপর নির্ভরশীল, কিন্তু তিনি এক এবং একা হওয়া সত্ত্বেও স্বয়ং-সম্পূর্ণ ও স্বনির্ভর ও সকলের আশ্রয়দাতা। সবকিছুর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়ার পরও তিনি চিরস্থায়ীভাবে অস্তিত্বমান থাকবেন, তাঁর উপরে কেউই নেই (লেইন)। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল, আল্লাহ এক - অদ্বিতীয়। এ আয়াতটি তা প্রমাণ করেছে এবং যুক্তি উপস্থাপন করেছে, বিশ্বজগৎ ও জীব-জন্তু ইত্যাদি সবকিছুই আল্লাহর উপর নির্ভর করে বাঁচে বা অস্তিত্বে টিকে থাকে। কিন্তু তিনি এমনই স্বাধীন ও স্বনির্ভর যে কাকেও এবং কোন কিছুকেও তাঁর কোন প্রয়োজন হয় না। তিনি সকল প্রয়োজনের উর্ধ্বে। বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করতে তাঁর না কোন জীব-জগতের সাহায্য নিতে হয়েছে, না জড়-বস্তুর। অপরদিকে বিশ্বজগতে এমন কিছুই নেই যা স্বয়ং-সম্পূর্ণ ও স্বনির্ভর, এমনকি অণু-পরমাণুও নয়। কোন কিছুই একাকী বাঁচে না বা টিকে থাকে না, বরং অন্য কিছুই ওপর নির্ভর করে টিকে থাকে। কেবলমাত্র আল্লাহই একমাত্র সত্তা যিনি জীব বা বস্তুর উপর নির্ভর করেন না। তিনি ধারণার ও কল্পনারও বহু উর্ধ্বে এবং তাঁর গুণাবলীর কোন সীমা-পরিসীমা নেই।

৪। *তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি^{৩৪৬৮}।

كَمْ يَلِدْهُ وَلَمْ يُولَدْ

১
[৫] ৫। *আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই^{৩৪৬৯}।

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

৩৭

দেখুন : ক. ১৭ঃ১১২; ১৯ঃ৯৩; ২৫ঃ৩; ৩৭ঃ১৫৩ খ. ৪২ঃ১২।

৩৪৬৮। আল্লাহ তাআলাকে পূর্ববর্তী আয়াতে ‘সামাদ’ (স্বাধীন, সর্বাধিপতি, স্বনির্ভর এবং অন্য সবকিছুরই ভরসাস্থল) বলা হয়েছে। এ গুণটি তাঁর একত্বকে বা ‘আহাদ’ হওয়াকে প্রতিপন্ন করে। এ আয়াতে বলা হয়েছে, তিনি জন্ম দেন না, জন্মগ্রহণও করেননি। এতে তিনি যে ‘সামাদ’ (প্রয়োজনের উর্ধ্বে), তা-ই প্রতিপন্ন হয়। কেননা যে প্রয়োজনের অধীন সে অপরের সাহায্য ছাড়া স্বীয় প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম নয় এবং তার আরদ্ধ কার্য সম্পন্ন করার জন্য তার মৃত্যুর পরও তার কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য কেউ থাকা প্রয়োজন। প্রাকৃতিক নিয়ম এটাই, যারা জন্ম দেয় ও জন্ম নেয় তারা মৃত্যুর অধীন ও প্রয়োজনের অধীন। আল্লাহ্ কারো স্থলবর্তী উত্তরাধিকারীরূপে আসেননি এবং কেউ তাঁর উত্তরাধিকারী হবে না। সর্বগুণে তিনি পরিপূর্ণভাবে গুণান্বিত, চিরস্থায়ী, চির-বিরাজমান, একচ্ছত্র অধিপতি তিনিই।

৩৪৬৯। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের বক্তব্যের পরেও আল্লাহ্র একত্ব সম্বন্ধে যদি সন্দেহের সামান্যতম অবকাশও থেকে যায় তা নিরসনের জন্য এ আয়াতটি এসেছে। যদি স্বীকৃতও হয় যে আল্লাহ্ এক-অদ্বিতীয়, একচ্ছত্র ও সর্বতোভাবে স্বনির্ভর-স্বাধীন এবং যদি এও স্বীকৃত হয়, তিনি জন্ম দেয়া- নেয়ার উর্ধ্বে, তথাপি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে, তাঁর মত ঐসব গুণ-সম্পন্ন অন্য কেউ তো থাকতে পারে। আলোচ্য আয়াতটিতে এ সন্দেহ ও সম্ভাবনাকে দূর করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, আল্লাহ্র মত অন্য কেউই নেই। মানুষের বিবেকও এ কথায় সায় দেয়, বিশ্বজগতের জন্য কেবল মাত্র একজন সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্ত্রক থাকা প্রয়োজন। মহাবিশ্বের নিয়ম-শৃংখলা, যা এর প্রতিটি রঞ্জে রঞ্জে দেখতে পাই তা তো একথাই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে, একই নিয়মের অধীনে সব কিছু নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এ একই নিয়ম-শৃংখলা প্রমাণ করে, এর সৃষ্টিকারীও একজনই (২১ঃ২৩)। এভাবে সূরাটি বহু-ঈশ্বরবাদী বিশ্বাসের মূল উৎপাটিত করেছে যা অন্যান্য ধর্মগুলোতে কোন না কোনভাবে টিকে রয়েছে। দুই, তিন বা ততোধিক আল্লাহতে বিশ্বাস কিংবা আল্লাহ্র সঙ্গে সমান্তরালভাবে বস্তু ও আত্মার চির-অবস্থিতি ইত্যাদি বিশ্বাস, যা অন্য ধর্মগুলোতে দেখতে পাওয়া যায়, এ আয়াতগুলো তার মূলে কুঠারঘাত করছে। এ সূরার আয়াতগুলোতে কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ্র যে পবিত্র ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেয়া হয়েছে, বিশ্বের অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের ঈশ্বর সম্পর্কিত বর্ণনা এ সৌন্দর্য, পবিত্রতা, সত্যতা ও মাহাত্ম্যের ধারে কাছেও পৌছতে পারেনি।